গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৭ জানুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বন্‌ধ গণআন্দোলনের শক্তিশালী হাতিয়ার

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, দুনিয়ায় সহজবুদ্ধি আয়ত্ত করাই সবচাইতে কঠিন। কথাটা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের কথায় ও আচরণে। কারণ সি পি এম ফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মানুষকে বোঝাতে চাইছে, গরিব মানুষকে আরও দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েই নাকি গরিবের উন্নয়ন করা যায় ! তাদের দাবি, তারা যে দফায় দফায় গরিবের ব্যবহার্য সব পরিষেবার হয় দাম বাড়াচ্ছে, না হয় বাড়তি কর - সেস চাপাচ্ছে, তা নাকি গরিবেরই উন্নয়নের জন্য। সি পি এম ও তাদের সরকার তারস্বরে প্রচার করে যে, পশ্চিমবঙ্গে গত ২৬ বছর ধরে যে সরকারটি রয়েছে, তা জনগণের সরকার, এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার থেকে আলাদা। কেন্দ্রের সরকার যেখানে ধনীদের স্বার্থে কাজ করছে, গরিব মধ্যবিত্ত জনগণের সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা পাওয়ার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তা করছে না, এই রাজ্যে সরকার চলছে জনকল্যাণের নীতি নিয়ে, গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতি অনুসরণ করে।

সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের দাবি ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক আসমান জমিন, যেটা আজ জনগণের চোখেও নগ্নভাবে ধরা পড়ছে। একটার পর একটা আর্থিক আঘাত মানুষকে জেরবার করে দিচ্ছে। ফলে, সরকারের দাবি একমাত্র তখনই মেনে নেওয়া সম্ভব যদি একটা জনকল্যাণমূলক সরকারের ভূমিকা বলতে কী বোঝায়, সেই ধারণাকেই ভুলে যাওয়া যায়। এবং সেটা ভুলিয়ে দিতেই সরকার আর্থিক সঙ্কটের ধুয়া তুলেছে। সি পি এম বলছে, সরকারের কোষাগার শূন্য, অতএব রাজস্ব বাড়াতে হবে। একথা বলেই তারা বিদ্যুৎ থেকে পানীয় জল, শিক্ষা থেকে চিকিৎসা, কৃষিজমি থেকে শহরের বাস্তুভিটা সব কিছুর মাশুল, ফি-কর-সেস হয় বাড়াচ্ছে, না হয় নতুন করে চাপাচ্ছে। সকলক্ষেত্রেই আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে গরিব মধ্যবিত্ত জনগণ। কিন্তু সরকারি কোষাগার কেন শূন্য হল? এজন্য কারা দায়ী? দীর্ঘদিন ধরে ঘাটতিশূন্য বাজেট দেখিয়ে আজ হঠাৎ ঘাটতি এমন বিপুল হয়ে গেল কেন? সরকারের টাকা কারা লুট করল? নিশ্চয়ই গরিব-মধ্যবিত্ত জনগণ নয়। তাহলে আজ সরকারের রাজস্ব বাড়াবার দায় তারা বহন করবে কেন? দায় তো বহন করবে বড় বড় পুঁজির মালিকরা যারা বামফ্রন্ট রাজত্বে সবচাইতে বেশি লাভবান হয়েছে, যেকোন পুঁজিবাদী সরকারের কাছ থেকেই যেটা তারা পেয়ে থাকে। একটা পুঁজিবাদী সরকারের নীতি হচ্ছে, গরিবের ঘাড়ে কর চাপিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার মুখে বামপন্থী ও জনমুখী বলে নিজেদের দাবি করলেও কাজ করছে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত একটি পুঁজিবাদী সরকারের মতই। প্রায় প্রতিদিনই সরকার যখন একটা না একটা মাশুল বা কর চাপাচ্ছে, না হয় বাড়াচ্ছে, তখন এ বিচার করছে না যে, জনগণ এই বাড়তি টাকা কোত্থেকে বা কী উপায়ে দেবে! জনগণের আয় কি বেড়েছে? রাজ্যে কি নতুন নতুন চাকরি হচ্ছে? তাহলে জনগণের ঘাড়ে বাড়তি মাশুল-দাম-ফি-চার্জ বাড়িয়ে ধনীদের, শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কর কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?

এটা বিদ্যুৎ মাশুলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নগ্ন। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন যে ক্রমাগত মাশুল বাড়াচ্ছে, এটা সরকারের জানা ছিল। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই ও বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি দীর্ঘদিন ধরে লাগাতার আন্দোলন করে আসছে। সরকার এমনই গণতান্ত্রিক যে, জনগণের এই প্রতিবাদে কানই দেয়নি, মাশুল বৃদ্ধির কোন বিরুদ্ধতা সরকার করেনি। এভাবে সরকারি মদতপুষ্ট হয়ে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এখন গৃহস্থ গ্রাহকদের ঘাড়ে বিপুল হারে মাশুলবৃদ্ধি চাপিয়ে ও শিল্পপতিদের মাশুল কমিয়ে নতুন হার ঘোষণা করেছে যা এখন সি ই এস সি'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, সত্বর

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, হাসপাতালের চার্জ ও শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, কোর্ট ফি ও কর বৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই ও অধিকার হরণ, সর্বনাশা কৃষিনীতি, ফসলের দাম না পাওয়া, জলকর, খুন-সন্ত্রাস-দুর্নীতির প্রতিবাদ সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে

এস ইউ সি আই-এর ডাকে

২৭ জানুয়ারি

বাংলা বন্‌ধ

সফল করুন

সর্বনাশা শিক্ষানীতির প্রতিবাদে বাঙ্গালোরে বিশাল ছাত্র সমাবেশ

৯ - ১২ জানুয়ারি বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ডিএস ও-র ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে বিশাল ছাত্রমিছিলের একাংশ। পাশে সমাবেশের মঞ্চ।

কে কে এম এস নদীয়া জেলা সম্মেলন

২৮ - ২৯ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার শহিদ আব্দুল ওদুদ নগরে (পলশুণ্ডা) অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নদীয়া জেলা সম্মেলন। ২৮ ডিসেম্বর বিকালে প্রকাশ্য সমাবেশ শুরু হয় হাসপাতাল ময়দানে। তিন হাজারেরও বেশি মানুষ প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে রাত পর্যন্ত খোলা ময়দানে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে সভার বক্তব্য শোনেন। সভার প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখ। প্রধান অতিথির ভাষণে এস ইউ সি আই দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে রাজ্য কমিটির পক্ষ হতে অভিনন্দন জানান। প্রধানবক্তা এস ইউ সি আই দলের পরিষদীয় নেতা দেবপ্রসাদ সরকার তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার জনজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যে আক্রমণ করছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, গদির স্বার্থে বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ বিষ ছড়াচ্ছে এবং সারা দেশে সংখ্যালঘু মানুষের মনে প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। জনজীবনের সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে পরিচালিত করার জন্য একইভাবে সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলি জঙ্গিদের ঘাঁটি ইত্যাদি কথা বলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিজেপি'র বাহবা কুড়োচ্ছেন, আতঙ্কিত হচ্ছে সংখ্যালঘু মানুষ। এককথায় ভোটের রাজনীতিতে ফায়দা লুটতে এ কাজগুলি তারা করে চলেছে। ২৬ বছর বামফ্রন্ট সরকারের ইতিহাস মালিকতোষণের ইতিহাস। ফলে চাষির ফসলের দাম পাওয়া ও গরিব মানুষকে কাজ দেওয়ার থেকে সিপিএম বেশি ভাবিত — হাসপাতালগুলি বেসরকারীকরণ করে, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে, শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করে কীভাবে মালিকদের পকেট ভরানো যায়, কৃষিক্ষেত্রকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করা যায়। তাই গরিব খেতমজুরদের দাবি আদায় করতে হলে চাই

লাগাতার আন্দোলন। এজন্য গ্রামে গ্রামে কৃষক ও খেতমজুরদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের তিনি আহবান জানান।

কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরডে সেখ খোদা বক্স তাঁর বক্তব্যে বামফ্রন্ট সরকারের খাজনা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

২৯ ডিসেম্বর শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনের সূচনা করেন এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী। প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড ধনপতি মণ্ডল ও কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখ। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড মহিউদ্দিন মণ্ডল সহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলন থেকে কমরেড দোয়াবক্স সেখকে সভাপতি ও কমরেড জাকিমউদ্দিন সেখকে সম্পাদক করে একটি জেলা কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়।

এই সম্মেলন থেকে কৃষক ও খেত-মজুরদের দাবিগুলি নিয়ে গ্রামে গ্রামে আগামী ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধের সমর্থনে ব্যাপক প্রস্তুতি চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সরকারি লাঠ্যৌষধি কি অহিংস ?

হিংসা করিয়া জগতে কোন বড় কাজ হয় নাই। এক শ্রেণীর মানুষ ইহা বলিয়া থাকেন। তথাপি হিংসা ঘটিয়া থাকে। কারণ হিংসার খনি এই ভূগর্ভেই অবস্থিত। এই বসুন্ধরা সম্পদে পরিপূর্ণ। কিছু মানুষ তাহা ভোগদখল করিতেছেন। আর দেশের অধিকাংশ মানুষ রিক্ত নিঃস্ব সর্বহারা। দুবেলা দুমুঠো খাবারের সংস্থান করিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইতেছে। ইহাদেরকে অহোরাত্র বলা হইতেছে হিংসা করিওনা, বিদ্বেষ ভুলিয়া যাও, এইভাবে মনকে পবিত্র নির্মল করো। এই অহিংসার তত্ত্ব বহুকাল ধরিয়াই প্রবঞ্চিতকে শোনানো হইতেছে। উদ্দেশ্য অতীব স্পষ্ট। যাহাতে তাহারা হৈ-চৈ বাধাইয়া সমাজের সুবিধা ভোগীদের নিদ্রাভঙ্গের কারণ না হন। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন বলিলেন, 'শ্রমিক আন্দোলনে হিংসার ঠাঁই নাই।' (আনন্দবাজার ১৮-১২-০২) অর্থাৎ আন্দোলন করিয়া, দাবিপত্র পেশ করিয়া মালিকের অশান্তি সৃষ্টি করা চলিবেনা। কিছুতেই মালিকের বিরুদ্ধে যাওয়া চলিবেনা। বিরুদ্ধে বলিলেই তাহা হিংসাপদবাচ্য হইবে। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন শ্রমিক হিংসাত্মক হইলেই কড়া হাতে দমন করা হইবে। মালিকের ভাড়াটে বাহিনী বা মালিকী স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত সরকারি পুলিশ বাহিনী শ্রমিকের ওপর লাঠিচার্জ করিলে, গুলি করিয়া মারিলে তাহা হিংসা পদবাচ্য হইবে না, কিন্তু শ্রমিকের ফুলের ঘায়ে মালিক মূর্চ্ছা গেলে তাহা হিংসা বলিয়া বিবেচিত হইবে। অদ্ভুত এই নিয়মের প্রবক্তা এবং প্রচারক এতদিন ধরিয়া মালিকী স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত বুর্জোয়া দলগুলি ছিল। ইদানীং তাহাদের শিবিরে যোগদান করিয়াছে সি পি আই (এম)। এই দলটি বামপন্থী তথাপি মালিকী মদতে গদির মধুভাণ্ডটি পাইবার আশায় মালিক পূজার জপমালা জপিতেছে। এই দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব বাঁচিয়া গিয়াছেন। কারণ কর্মীরা প্রশ্ন করেন না, তর্কে লিপ্ত হননা। প্রশ্ন তুলিলেই বিরোধীদের চর হিসাবে চিহ্নিত করিয়া অর্ধচন্দ্র প্রদান করিবে। সুতরাং তাঁহারা নীরব। কর্মীরা নিশ্চয়ই দেখিতেছেন শ্রেণী সংঘর্ষের, শ্রেণী দ্বন্দ্বের (class struggle) তত্ত্ব হইতে সরিয়া গিয়া সি পি আই (এম) শ্রেণী সমন্বয়ের গান্ধীবাদী তত্ত্ব অনুসরণ করিতেছে। বামপন্থী কবি সুকান্ত বলিয়াছিলেন 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' আর তাঁহারই উত্তরসূরী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলিতেছেন, "এ বিশ্বকে মালিক পুঁজিপতিদের বাসযোগ্য করে যাব আমি।" এই শীতের রাতে বুলডোজার দিয়া জনবসতি উচ্ছেদ করিতেছেন, হতদরিদ্র মানুষগুলির কুঁড়েঘর ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছেন। তারপর স্মিতহাস্যে টেলিভিশনের সামনে ভাষণ দিতেছেন 'আমরা গরিব সর্বহারার দল! আমরা দায়িত্বশীল। আমরা হিংসা বরদাস্ত করিবনা।' সি পি আই (এম) নেতাদের এই পারদর্শিতার পুরস্কার অচিরেই মিলিবে। তাহাদের এই দায়িত্বশীলতার পুরস্কার মালিকশ্রেণী ষোল আনার ওপর আঠারো আনা পুষাইয়া দিয়াছেন। অতএব মাভৈঃ!

আন্দোলনের চাপে ফেরি সার্ভিসের ভাড়া কমল

হলদিয়া পুরসভা কর্তৃক ফেরি সার্ভিসের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে নন্দীগ্রাম-হলদিয়া ফেরিঘাট যাত্রী সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার, ফেরি সার্ভিসের সার্বিক উন্নয়ন এবং ইজারাদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে হলদিয়া মহকুমা শাসক, নন্দীগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকদের অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৫ জানুয়ারি থেকে খেয়া বয়কট করা হয়।

অবশেষে গত ৮ জানুয়ারি মহকুমা শাসক আহূত সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, এস ডি ও, হলদিয়া পুরসভার প্রতিনিধি সহ যাত্রীকমিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মহকুমা শাসক ঘোষণা করেন যে যাত্রীভাড়া কমিয়ে ২ টাকা করা, ইজারাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা এবং ১ মাসের মধ্যে যাত্রীদের অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে।

হাবড়ায় ভ্যানচালকদের আন্দোলন

ভ্যানচালকদের যাত্রী-পরিবহনের অধিকার, বিনা খরচে লাইসেন্স, তাদের বি. পি. এল তালিকাভুক্তি এবং তাদের উপর পুলিশ-প্রশাসনের হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে হাবড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সহস্রাধিক ভ্যানচালক গত ৯ জানুয়ারি সুসজ্জিত মিছিল সহকারে বারাসতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন ভ্যানচালক সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে।

প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন হাবড়া ভ্যানচালক সংগ্রাম সমিতির সম্পাদক পতিত পাবন মণ্ডল, দিলীপ বণিক, বিশ্বজিৎ সমাদ্দার, রবীন মণ্ডল, আজিজুল হক মণ্ডল, সুকুমার দাস, সুবোধ দেবনাথ, নির্মল কীর্তনীয়া, রিপন ভৌমিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ডেপুটেশন শেষে সম্পাদক পতিতপাবন মন্ডল সমস্ত ভ্যানচালকদের প্রত্যেক স্ট্যাণ্ডে গিয়ে কমিটি গঠনের আহবান জানান এবং আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই সমিতিকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কথা বলেন।

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির ফলতা থানা সম্মেলন

ঋণগ্রহীতাদের প্রশাসনিক হয়রানির প্রতিবাদে ও সকল কর্মক্ষম বেকারের কাজের দাবিতে ২১ ডিসেম্বর সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা থানা দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যোগ দিতে থানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ঋণগ্রহীতা সমবেত হন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদক সুরথ সরকার। প্রভাত পালকে পুনরায় সম্পাদক ও মনোরঞ্জন মণ্ডলকে সভাপতি করে ২১ জনের এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে ও প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীপক ব্যানার্জী।

মুখোশ খুলে মুখ দেখালেন প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দ্বারা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে বিকৃতি নিয়ে দেশজোড়া প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও এতদিন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সরাসরি বিশেষ কিছু মন্তব্য করেননি। গত ৬ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে বিজেপি নেতা হাসু আদবানির স্মৃতিতে 'বিবেকানন্দ এডুকেশন সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় বাজপেয়ীজী দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের সমস্ত রকম প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে খোলাখুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক ইতিহাস বিকৃতির সমস্ত পদক্ষেপকেই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'অতীত সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রকৃত তথ্য পৌঁছে দিতেই এই প্রয়াস।'এবং 'সরকার নিজের স্বার্থে এই পরিবর্তন করছে না।' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য কতখানি সত্য তা বিচার করে দেখা যাক।

প্রথমত, বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সংঘ পরিবারের প্রথম সারির নেতা মুরলী মনোহর যোশীকে মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর অর্থাৎ শিক্ষাদপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব দেয়। এই মন্ত্রকটির অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সংঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের ইতিহাসকে পরিবর্তিত করে শিশু বয়স থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে 'হিন্দু গৌরবে'র নামে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া। এই কারণেই শিক্ষামন্ত্রক নিজেদের হাতে রাখার উপর সংঘ পরিবার জোর দিয়েছিল। আর এস এস-এর মুখপত্র 'অরগানাইজারে' আর শেষাদ্রিচারি মন্তব্য করেছিলেন, 'আর এস এস মনে করে মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর তাদের কাছে অর্থমন্ত্রকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং .... এই মন্ত্রকটি আমরা চাই আর এস এস-এর জন্য সংরক্ষিত থাকুক। (দি স্টেটসম্যান সাপ্লিমেন্ট, ৬-১২-১৯৯৮)

আর এই মন্ত্রকটি হাতে পেয়ে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণকারী সমস্ত সংস্থার মাথায় নিজেদের লোক বসিয়ে সেগুলিকে পুরোপুরি কুক্ষিগত করেছে, একথা প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয়ই অজানা নয়। একথাও তিনি ভালই জানেন যে, ১৯৯৮ সালের মে মাসে ক্রোয়েশিয়ায় বিশ্ব প্রত্নতাত্ত্বিক কংগ্রেসে বর্ণবাদী ও ধর্মভিত্তিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চার এবং 'বাবরি মসজিদ' ধ্বংসের বিরুদ্ধে গৃহীত নিন্দা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন যে তিনজন তাদের মধ্যে দু'জন — বি. বি. লাল ও বি. আর গ্রোভারকে তাঁর সরকার ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের (ICHR) সদস্য হিসাবে মনোনীত করেছে। এই পরিষদের চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়েছে কে এস লালকে। এঁর পরিচয় হল, ইনি ১৯৭৩ সালে 'গ্রোথ অব মুসলিম পপুলেশন ইন মেডিয়াভাল ইণ্ডিয়া' নামে বই লিখে মুসলিম কর্তৃক হিন্দু নিধনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং কিভাবে ভারতের জনসংখ্যা এর ফলে ১৯০ মিলিয়ন থেকে ১২০ মিলিয়নে নেমে এসেছিল, জনগণনার কোনও প্রমাণ ছাড়াই তার বিবরণ দিয়েছেন। এই কে এস লালকেই নিয়োগ করা হয়েছে ইতিহাসের পাঠ্যবই পরিবর্তিত করে ইতিহাসের পুনর্লিখনের মাধ্যমে 'আদর্শ' স্কুলপাঠ্য ইতিহাস রচনা করার দায়িত্বে। ICSS এর চেয়ারম্যান করা হয়েছে বিজেপি সদস্য এম এল সোন্ধিকে। NCERT-র মাথায় আনা হয়েছে জে এস রাজপুতকে এবং UGC-র চেয়ারম্যান করা হয়েছে হরি গৌতমকে। শুধু তাই নয়, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এ্যাডভান্সড স্টাডিজ (সিমলা)-র চেয়ারম্যান করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ গোবিন্দ চন্দ্র পাণ্ডেকে এবং গভর্নিং বডির সদস্য করা হয়েছে সংঘ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ডঃ কিরিট যোগীকে। কলকাতার মৌলানা আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজে বিজেপি সাংসদ তপন সিকদার ও তাদেরই জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাজপেয়ীজীর সরকারই নিয়োগ করেছিল। (দি টেলিগ্রাফ, ২-৮-৯৮)।

এই সমস্ত সংস্থার পরিচালনভার বিজেপি ও সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি 'প্রকৃত তথ্য' পরিবেশন করা, নাকি সংঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাসকে বর্ণনা করা? যেমন আমরা পশ্চিমবাংলায় দেখি, সমস্ত শিক্ষাপরিচালন সংস্থায় সি পি এম দলের নেতা কর্মী সংগঠক বা তাদের অনুগামীদের বসিয়ে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে হীন দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই নীতি গণতান্ত্রিক চিন্তার বিরোধী। যথার্থ বামপন্থী দল হলে সি পি আই (এম) এই অগণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারত না। কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপও একই রকমের। তাই তাদের ইতিহাসের পুনর্লিখনের বাস্তব কথাটি হল শুদ্ধিকরণের নামে ইতিহাসের বিকৃতি সাধন। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান কমিয়ে, পঠন-পাঠন গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে পুরাণে বর্ণিত সরস্বতী নদীর প্রবাহ খোঁজার জন্য অর্থবরাদ্দ করা হচ্ছে। ICHR-এর নয়টি প্রকল্পের মধ্যে পাঁচটি প্রকল্পই দেওয়া হয়েছে ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজিকাল সোসাইটিকে। এই প্রকল্পগুলির কাজ এটা প্রমাণ করা যে, বৈদিক সভ্যতার যুগে সরস্বতী নদী ছিল এবং সিন্ধুসভ্যতা শুধু সিন্ধুনদীর তীরে গড়ে ওঠেনি,

পাঁচের পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেচছে পানীয় জল, কেরালা সরকার বেচছে নদী

দেশে এখন দিকে দিকে উন্নয়নের বান ডেকেছে। আর তেমন তেমন বান হলে যা হয়, সব কিছু ভাসিয়ে, শস্যশ্যামলা ক্ষেতের ওপর পুরু বালির আস্তরণ ফেলে মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়ে। গোটা দেশে সাধারণ মানুষের জীবনে এখন সেই সর্বনাশের বান ডেকেছে।

যেমন ধরা যাক, এই পশ্চিমবাংলা রাজ্যের কথা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, আইন-আদালত অর্থাৎ ন্যায়বিচার, জমির খাজনা, কাঁচা-পাকা-ঝুপড়ি যেমন হোক্ না কেন মাথা গোঁজার ঠাঁই, রুজি-রোজগারের একমাত্র অবলম্বন — সব কিছু আজ রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নের বানে ভেসে যেতে চলেছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভার লাগসই দোহার, তাঁরাই বা কম যান কেন?

সম্প্রতি এই উন্নয়নের রাহুগ্রস্তদের তালিকায় যোগ হয়েছে মুক্ত হাওয়া আর পানীয় জল। সারাদিন কলকাতার বিষাক্ত হাওয়া বুকে নেওয়ার শক্তি খুঁজতে কিছু মানুষ ভোরবেলায় বা বিকালে কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকে হাঁটতে বেরোন বা নিতান্তই বেড়াতে যান। এখন তার জন্যও মাত্র তিনটাকা দক্ষিণা লাগবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধের বাগান বা দক্ষিণ কলকাতার আরও দু'একটা পুরসভার উদ্যান ত' ইতিমধ্যেই পয়সাওয়ালাদের দখলে। একই সঙ্গে কলকাতায় পানীয় জলের উপর কর বসাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুরমন্ত্রী সদম্ভে ঘোষণা করেছেন এ নিয়ে কোন বিরোধিতা বরদাস্ত করা হবে না। কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসি মেয়র পিছিয়ে থাকবেন কেন। তিনিও বলেছেন, কোনমতেই বিনা পয়সায় জল মিলবেনা। জলকর বসানোর পিছনে রাজ্য সরকারের যুক্তি হচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্ক শহরের উন্নয়নের জন্য যে টাকা দিচ্ছে, তার শর্তই হল জলকর বসাতে হবে। আজও সি পি এম হাটেবাজারে পাড়ার মধ্যে মিটিং করার সময় জানায় বিজেপি কেমনভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কাছ দেশকে বিকিয়ে দিচ্ছে। আর পরক্ষণেই লক্ষ্মী ছেলের মত বিশ্বব্যাঙ্কের শর্ত মেনে সাধারণ মানুষের নুয়ে-পড়া পিঠের ওপর জলকরের বোঝা চাপিয়ে দেয়। কেন— না, উন্নয়ন করতে হবে ! সাধারণ গরিব মধ্যবিত্ত মানুষকে মেরে এই উন্নয়ন কার জন্য — এই প্রশ্নটার উত্তর তাঁরা দেবেন কি? অথচ এই সি পি এম মালদহ পুরসভায় জলকরের বিরুদ্ধে লড়ছে — কারণ সেখানে পুরসভা তাদের হাতে নেই। একে দ্বিচারিতা বললে অবশ্য সি পি এম বলতে পারে — এ নিয়ে শুধু তাদের দোষ দেওয়া কেন? তারা একাই ত' এ কাজ করছে না। কংগ্রেস এ রাজ্যে জলকরের বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বলছে। অথচ এই কংগ্রেসের এণ্টনী মন্ত্রীসভা কেরালায় গ্লোবাল ইনভেস্টর্স মিট (জি আই এম) অর্থাৎ বিশ্ব বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে পেরিয়ার ও মালামপুঝা জলসরবরাহ প্রকল্পের নামে একটা বাঁধ সমেত দু'দুটো নদীকে যথাক্রমে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের দুই বহুজাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিতে চেষ্টা চালাচ্ছে। এর মধ্যে পেরিয়ার নদী ও লেক সংলগ্ন অঞ্চল শুধু বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রই নয়, দেশের অরণ্য সম্পদেরও অন্যতম অঙ্গ। আর মালামপুঝা জলাধার হল ঐ অঞ্চলের সেচের জল সরবরাহের অন্যতম উৎস। কেরালায় কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রীদের কথা হল, এই দু'জায়গার জল সরবরাহ করা হবে পালামুড় জেলার কাঞ্জিকোড, কোটি ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন নির্মীয়মান বা প্রস্তাবিত শিল্পোদ্যোগ বা তাদের সংশ্লিষ্ট আবাসনে। এর ফলে জি আই এম-এর আওতায় প্রস্তাবিত ৩১০০০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি পুঁজিলগ্নিকে ভর করে তরতর করে উন্নয়ন হবে। কিন্তু তাদের এই সাধে বাধ সেধেছে সে রাজ্যের লেখক, শিল্পী-স্থপতি-পরিবেশবিদরা।

জ্ঞানপীঠ-পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক এম টি বাসুদেবন নায়ারের নেতৃত্বে এঁরা তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এই নদী বেচার প্রকল্পের। তাঁদের বক্তব্য ইতিমধ্যেই দূষণ ও বালিতোলায় পেরিয়ার বিপন্ন। তার ওপর ঐ নদী থেকে জল তুললে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হবে, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী পেরিয়ার অঞ্চল বিনষ্ট হবে। মালামপুঝার প্রস্তাবিত আশি শতাংশ জল নিলেও সেচের সর্বনাশ হবে, পরিবেশও নষ্ট হবে। ফলে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশের যে হাল হয়েছে, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তাছাড়া সরকার যে বলছে ব্যক্তিমালি-কানাধীন জলপ্রকল্পের মাধ্যমে গৃহস্থবাড়িতেও সুষ্ঠুভাবে জলসরবরাহ করা হবে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন যে তা হবার নয়। কারণ ব্যক্তি মালিকানায় জলসরবরাহ একবার শুরু হলেই মানুষকে অস্বাভাবিক দাম দিয়ে জল কিনতে হবে। প্রবল বিক্ষোভের সামনে পড়ে এণ্টনি সরকার আপাতত প্রকল্পটিকে মুলতুবি রাখার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নের লোভ বড় সাংঘাতিক! তাই প্রতিবাদে ঢিলে দিলেই ঝুলি থেকে বেড়াল আবার বেরুবে। কোন সন্দেহ নেই।

এ রাজ্যের মানুষকেও সেকথা মনে রাখতে হবে। উন্নয়নের মায়াহরিণের পিছনে দৌড়ানোয় সি পি এম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি কেউই পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। প্রশ্নটা খালি কে কোথায়, কখন দৌড় শুরু করবে। তাই সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে এদের রুখতে না পারলে এরা, যার মধ্যে সি পি এম অগ্রগণ্য, একের পর এক আঘাত হেনে জনগণকে নিংড়ে শেষ করবে। শহর-রাজ্য-দেশটাকে কেবল পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের ভোগের স্বর্গ করে তুলতে চাইবে।

(কেরালার সংবাদের সূত্র ঃ দি হিন্দু ৩০ ডিসেম্বর, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ২৬ ডিসেম্বর, ২০০২)

নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন বাপি সেন

৩১ ডিসেম্বর রাতে প্রকাশ্য রাজপথে পাঁচ ছ'জন পুলিশ দুর্বৃত্তের হাতে এক মহিলাকে আক্রান্ত হতে দেখে, এগিয়ে গিয়েছিলেন আর এক পুলিশ সার্জেন্ট বাপি সেন। শেষপর্যন্ত সেই পুলিশ দুর্বৃত্তদের নৃশংস আক্রমণে বাপি সেন মারা যান। আমাদের দল এস ইউ সি আই ইতিমধ্যেই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের, দোষী পুলিশদের শাস্তির ও নিহত বাপি সেনের পরিজনদের উপযুক্ত আর্থিক পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে, ৯ জানুয়ারি সারা রাজ্যে শোকদিবস পালন করেছে।

সাহসী, প্রতিবাদী বাপি সেনের এই মৃত্যু গোটা রাজ্যের মানুষকে আলোড়িত করে তুলেছে। এই ঘটনা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এই রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসনের হাল কোথায় এসে ঠেকেছে। দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবি উঠলে পুলিশের বড়কর্তারা প্রথমদিকে — 'আর কি করব? ওদের ধরে ফাঁসি দেব?' — গোছের কথা বলে ব্যাপারটাকে হাল্কা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের বিক্ষোভ ও রোষের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে আঁচ করতে পেরে পুলিশ-প্রশাসন-সরকার দেখাতে শুরু করে তারাও দোষী পুলিশদের শাস্তি দেবার দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু একইসঙ্গে পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের মুখ দিয়ে যুক্তি বেরোতে শুরু করেছে — 'ডিউটি আওয়ারের বাইরে কেউ কিছু করলে তা শৃঙ্খলাভঙ্গের পর্যায়ে পড়বে কি করে।' অভিযোগ উঠেছে, ব্যারাকের হাজিরাখাতায় হেরফের করে ঐ দুর্বৃত্ত কনস্টেবলরা ঘটনার সময় ব্যারাকেই ছিল তা দেখানোর চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে ঘটনার বিবরণে প্রচার হচ্ছে, মহিলাটি নাকি হাত নেড়ে ঐ দুর্বৃত্ত কনস্টেবল-দের প্ররোচিত করেছিল। অর্থাৎ জনমতের চাপে 'কিছু' শাস্তি দিতে হলেও, তাকে কতটা লঘু করে দেওয়া যায়, সেই অপচেষ্টা চলেছে। যেভাবে বিভিন্ন মহল থেকে ঘটনার গুরুত্ব লঘু করে দিয়ে দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা আবার নতুন করে তুলে ধরতে চাই।

পুলিশ-প্রশাসন-সরকারের তরফ থেকে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে পুলিশ কনস্টেবলদের হাতে বাপি সেনের মৃত্যু নিছকই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এ ঘটনা পুলিশীব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার কোন নিদর্শন নয়। পুলিশেও বহু ভাল লোক আছেন, তাঁরা অবশ্যই এই ঘটনার নিন্দা করছেন। ফলে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও ঔপনিবেশিক শাসনের ঐতিহ্য নিয়ে যে পুলিশী ব্যবস্থা চলছে, তাকে উদ্দেশ্য করে এদেশেরই এক বিচারপতি জাস্টিস মোল্লা বহুদিন আগে বলেছিলেন, পুলিশ হল সবচেয়ে সংগঠিত অপরাধী দল। এমন এক ব্যবস্থায় সত্যিকারের সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মী-অফিসাররা থাকতে পারেন, কিন্তু কতদূর পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁরা কাজ করতে পারেন, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের পঁচিশ বছরের শাসনে পুলিশী ব্যবস্থার কি হাল হয়েছে, তা জনসাধারণ প্রতিদিন টের পাচ্ছেন। শুধু জনান্তিকে বা ব্যক্তিগত আলোচনাতেই নয়,

৯ জানুয়ারি এস ইউ সি আই আহূত রাজ্যব্যাপী শোকদিবসে দলের রাজ্য কার্যালয়ের সামনে শোকবেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

বাপি সেনের ঘটনার পর একাধিক প্রাক্তন পুলিশ অফিসারও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে তাদের মতামত দিতে গিয়ে সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন, এই সরকারের আমলে যেভাবে পুলিশ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তাতে পুলিশবাহিনী আজ সম্পূর্ণ অযোগ্য কর্মীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বস্তুত সি পি এম-এর মন্ত্রী-এম.পি-এম.এল.এ থেকে শুরু করে নীচু স্তরের পার্টি নেতাদেরও সুপারিশে নিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বেশির ভাগেরই যোগ্যতা কর্মদক্ষতা নয়, একমাত্র যোগ্যতা দলীয় আনুগত্য, সুপারিশকর্তার প্রতি আনুগত্য। ফলে এই পুলিশবাহিনী আজ সি পি এম রাজত্বে এক নিতান্ত দলীয় লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। থানাগুলি চলে কার্যত স্থানীয় সি পি এম পার্টি নেতাদের নির্দেশে। বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুলিশকে নগ্নভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশও পার্টি নেতাদের নির্দেশে সমস্তরকম অন্যায় কাজ করছে, সাথে সাথে সেই সুযোগে বাড়িয়ে চলেছে প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়া, ধর্ষণ, খুন, অত্যাচার প্রভৃতি নানা বে-আইনী কার্যকলাপ। গোটা পুলিশবাহিনীতে নিয়মশৃঙ্খলা, কর্তব্যপরায়ণতা সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে। এই অবস্থায় পুলিশের মধ্যে দলীয় লেজুড় বাহিনীর এক অংশ আজ চূড়ান্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা জানে, তারা যাই করুক না কেন, তাদের পিছনে আছে খুঁটির জোর। তাই আইনের রক্ষক হয়েও দুপায়ে আইন মাড়িয়ে নির্বিচারে খুন-ডাকাতি-ঘুষ নেওয়া-ধর্ষণ ইত্যাদি করতে এদের এতটুকু আসে যায় না। এই অবস্থারই প্রতিফলন ঘটে থানা লক-আপে পিটিয়ে মারা, প্রিজন ভ্যানে ধর্ষণ, শেষপর্যন্ত প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ জেনেও পুলিশের দ্বারাই বাপি সেনকে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনায়। এমনকি বাপি সেনকে হত্যার ঘটনা সারা দেশের মানুষ জেনে যাওয়ার পরও আজ যে পুলিশেরই বিভিন্ন মহল থেকে প্রচ্ছন্ন কৌশলে অপরাধীদের আড়াল করার, নানা কূট প্রশ্ন তুলে অপরাধকে লঘু করার চেষ্টা করা হচ্ছে — এই প্রক্রিয়াও প্রমাণ করে পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে কোন্ শক্তি আজ কাজ করছে।

বস্তুত রাজ্যের মানুষ আজ দেখছে যে, স্কুল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, জেলার সরকারি অফিস থেকে মহাকরণ, থানা থেকে লালবাজার — প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে গোটা প্রশাসন চলছে দলীয় নেতাদের অঙ্গুলি নির্দেশে। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার লেশমাত্র না রেখে এইসব নেতাদের নির্দেশে নিয়োগ হচ্ছে, সুবিধা বিতরণ হচ্ছে, পছন্দ না হলে শাস্তিও দেওয়া হচ্ছে। পুলিশে চাকরি দেওয়া দলের এই সমস্ত লোকেরাই, র‍্যাঙ্ক যাই হোক না কেন, বাস্তবে পুলিশ বাহিনীতে কর্তৃত্ব করছে। ফলে সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্মী-অফিসাররা এই অবস্থায় বিরক্ত, হতাশ, শেষে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছেন। প্রশাসন গিয়ে পড়ছে কিছু অযোগ্য, বশংবদ, মেরুদণ্ডহীন এমন কি দুর্বৃত্তদের হাতে।

তাই বাপি সেনের হত্যাকারীদের বিচার শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও বলতে হয়, ঐ কয়েকটি দুর্বৃত্ত কনস্টেবলের শাস্তি হলেও পুলিশবাহিনীর চরিত্রের কোন পরিবর্তন হবেনা, বাহিনীরও হাল ফিরবে না — যতক্ষণ সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার সমস্যার মূল কারণকে চিহ্নিত করে তার থেকে পুলিশী-ব্যবস্থাকে মুক্ত না করছে, প্রশাসন তথা পুলিশবাহিনীকে দলীয় লেজুড়ে পরিণত করা থেকে সরে আসছে। আইন-মাফিক প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পুলিশের কাজ করার পরিবেশ যতক্ষণ সৃষ্টি করতে না পারছে — ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশের হাতে লকআপে পিটিয়ে মারা, থানা বা প্রিজন ভ্যানে ধর্ষণ, আন্দোলনরত মহিলাদের প্রকাশ্য রাস্তায় সম্ভ্রমহানি করার মত ঘৃণ্য ঘটনা ঘটা বা বাপি সেনের মত অন্যায়ের প্রতিবাদীকে পিটিয়ে মারার মত নজিরবিহীন ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটার সমস্ত সম্ভাবনা থেকে যাবে। আর এমন ঘটনা ঘটলে মন্ত্রীরা বলবেন, আইনশৃঙ্খলার স্বর্গরাজ্য 'পশ্চিমবাংলায় এ এক নিছক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। দেখছি, যাতে দোষীরা সাজা পায়' — এই ধরনের উক্তি করে কর্তব্য সারবেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সংগ্রামী ঐতিহ্য যে রাজ্যের আছে সেই পশ্চিমবাংলার মানুষ কি এই জিনিষ বারবার হতে দেবেন?

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ধিক্কার

সারা বাংলা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় পুলিশ সার্জেন্ট বাপি সেনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

"এক মহিলার সম্ভ্রমরক্ষা করতে গিয়ে বাপি সেন যেভাবে বীরের মৃত্যুবরণ করলেন তা সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ।

যে সমস্ত পুলিশ কনস্টেবলরা আইনের রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা নিয়ে মহিলার ইজ্জতহানি করতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি, এমনকি বাধাদানকারী বাপি সেনকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে, আমরা সেই আক্রমণকারীদের তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।"

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ঐ দিন নিহত বাপি সেনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে তাঁর নির্ভীক আত্মদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অশোক হালদার ও মোসলেম মিস্ত্রির খুনিদের পুলিশের হাতে তুলে দিলেন নলগড়ার মানুষ

গত ১০ জানুয়ারি গভীর রাতে কুলতলির নলগড়া গ্রামে সি পি এম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এস ইউ সি আই সমর্থকদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়। এই দুষ্কৃতীরাই গত ১ অক্টোবর নলগড়া এস ইউ সি আই অফিস আক্রমণ করে জেলা কমিটির তরুণ সদস্য কমরেড অশোক হালদার ও দলের সক্রিয় কর্মী কমরেড মোসলেম মিস্ত্রিকে হত্যা করেছিল। স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ এবং ঘৃণার ভয়ে এরা মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল। ১০ জানুয়ারি অসৎ উদ্দেশ্যে তারা এলাকায় প্রবেশ করলে ১১ তারিখ সকালে স্থানীয় মানুষ বিশেষত মহিলারা তাড়া করে তাদের তিনজনকে ধরে ফেলেন এবং ঐ দুষ্কৃতীদের স্থানীয় ক্যাম্পের পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে অস্বীকার করলে স্থানীয় কয়েক হাজার মানুষ ক্যাম্প ঘেরাও করেন। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা ঘেরাও থাকার পর পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ঐ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হন। জনতার পক্ষ থেকে পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, খুনিদের এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবেনা।

হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি

সরকার বলছে টাকা নেই, জনগণের টাকা কি উপচে পড়ছে !

বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে অস্বাভাবিক শিশুমৃত্যুর পর হাসপাতাল সুপার বলেছিলেন, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জাম নেই, এক বেডে একাধিক শিশুরোগী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন — কোন কিছুর অভাব নেই। হাসপাতাল সুপারকে বদলি করে দেওয়া হল। তিনি বড় বেশি কথা বলেছেন। এস এস কে এমের মতো প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসা করাতে এসে মাথায় কংক্রিটের চাঙড় ভেঙে পড়ে মারা গিয়েছেন মেনকা দাস। শহর কলকাতার হাসপাতালেরই এই হাল, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী অভাবের কথা মানতে নারাজ। তাঁর মতে সরকারি ব্যবস্থায় কোন ঘাটতি নেই। তিনি খবরের কাগজে দুবেলা গরম গরম ফরমান দিচ্ছেন। শুধু স্বাস্থ্যমন্ত্রী নয়, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের লক্ষ্য করে অপমানকর কটূক্তি পর্যন্ত করেছেন। সরকারি ভাষ্য শুনলে মনে হবে হাসপাতালের যাবতীয় অব্যবস্থার জন্য দায়ী হলেন ডাক্তার ও নার্সরা। অব্যবস্থার উপর আছে সরকারি দলের নেতা মন্ত্রীদের জমিদারি চাল। নীলরতন সরকার হাসপাতালে জনৈক নার্সের ব্যবহার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকটাত্মীয়ের পছন্দ হয়নি, অতএব দুদিনের মধ্যে তাঁর বদলির আদেশ এসে গেল। বিক্ষুব্ধ নার্সরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্য সভায় স্পষ্ট জানালেন, রোগী অনুপাতে নার্স অত্যন্ত কম। কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। বক্তৃতার মাঝে নার্সদের স্লোগানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী খুব বিরক্ত হলেন। এই বেআদপি বরদাস্ত করা হবে না। সরকার টাকা দেবে না, ওষুধ চিকিৎসা সরঞ্জাম দেবে না, হাসপাতালের বাড়ি সারাই করবে না, ডাক্তার-নার্স নিয়োগ না করে শূন্যপদ ফেলে রাখবে — তাতে কোন বেআদপি নেই। মন্ত্রীর বক্তৃতার মাঝে স্লোগান তোলা অন্যায়, কিন্তু প্রকাশ্য সভায় ডাক্তার-নার্সদের প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কটূক্তি অন্যায় নয়। সরকারি অবহেলাকে আড়াল করে হাসপাতালে অব্যবস্থার জন্য কেবল ডাক্তার-নার্সদের দায়ী করে ক্ষুব্ধ জনতার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দেওয়াটাও অন্যায় নয়। কারণ যাঁরা এগুলি করছেন তাঁরা মন্ত্রী।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাজেট ভাষণে বলেছিলেন জনস্বাস্থ্য জনগণের হাতেই সুরক্ষিত। বাস্তবে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে টাকা দিয়ে জনগণকে তা পেতে হবে। পরিষেবার উন্নতির দোহাই দিয়ে সরকার চার্জ বাড়াচ্ছে, পে-ক্লিনিক চালু করছে। পথ্যের দাম আদায় করছে। শহরের ও জেলার বড় বড় হাসপাতালে ব্যবসায়ীদের জমি-বাড়ি দিয়ে সি টি স্ক্যান মেশিন বসানো, ওষুধের দোকান বসানোর ব্যবস্থা তাঁরা করছেন। হাসপাতালের সাফাই, সিকিউরিটি, ধোবি, পথ্য সরবরাহ বেসরকারি হাতে তাঁরা ছেড়ে দিচ্ছেন; বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ডায়ালিসিস ইউনিট, বিভিন্ন হাসপাতালের প্যাথোলজি বিভাগ বেসরকারি হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন। এর আগেই নিরাময়, মেয়ো হাসপাতাল, লেডি ডাফরিন হাসপাতাল রাজ্য সরকার বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে। কে এস রায় টি বি হাসপাতালও বেসরকারি হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা করে ফেলেছিলেন, কিন্তু হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি এবং কে এস রায় টি বি হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির আন্দোলন এবং বৃহত্তর চিকিৎসক সমাজের বিরুদ্ধতার ফলে আপাতত তাঁরা পিছু হঠেছেন।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর এ-বছরের বাজেট ভাষণে বলেছিলেন — "বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে বেসরকারি ক্ষেত্র বড় জোর সরকারি প্রচেষ্টার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কোনভাবেই এর বিকল্প হতে পারে না।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের ৩৭% আসে সরকারি বাজেট থেকে, বাকি ৬৩ শতাংশ আসে বেসরকারি সূত্র থেকে। এ বছর রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বাজেটে পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ৪২৬ কোটি থেকে কমিয়ে ২৮৪ কোটি করেছে। পরিকল্পনা খাতে ব্যয় কমানোর অর্থ হল হাসপাতাল পরি-ষেবার

আটের পাতায় দেখুন

ইতিহাসের বিকৃতির সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

সরস্বতী নদীর অববাহিকাতেও তার বিকাশ হয়েছিল। উগ্র 'হিন্দুত্বের' ধারণা অনুযায়ী এইসব 'সিদ্ধান্ত' আগে গ্রহণ করে তাকেই নানান সংস্থার মাধ্যমে 'প্রমাণ করার' চেষ্টার দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'প্রকৃত তথ্য' ছাত্রদের পরিবেশন করা হচ্ছে কি? উল্লেখ্য হল, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এ্যাডভানসড্ স্ট্যাডিজ (সিমলা)-এর কাজকর্মে আগে যেখানে সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল, 'সন্ত্রাসের সমস্যা,' 'গণতন্ত্র ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবাধিকার', 'ভারতে আদিবাসীদের অবস্থা', 'উত্তরপূর্ব ভারতে আন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্কে গতিশীলতা' ইত্যাদি, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর তথা সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির হাতে পরিচালনভার আসার পর সেমিনারের বিষয়বস্তু হচ্ছে — 'অভিনব গুপ্তের রস সিদ্ধান্ত', 'তন্ত্রসংগ্রহের ৫০০ বছর', 'স্মৃতিশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা' প্রভৃতি। এর উদ্দেশ্য বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার ও তাকেই ইতিহাসের ঘটনা বলে উপস্থিত করা, এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ফলে প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন, এটা ইতিহাস বিকৃতি নয় এবং সরকার তার নিজের স্বার্থে এসব করছে না, তা একটি পরিপূর্ণ মিথ্যা।

বাজপেয়ীজী বলেছেন প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার জন্যই নাকি তাঁর সরকার এগুলি করছে। কিন্তু সরকারের প্রধান হয়ে একথা তো তাঁর অজানা নয় যে, এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন, 'এতদিন যারা সরকারে ছিল তাদের দিন গিয়েছে চলে, এখন বিজেপি'র পালা।' অর্থাৎ বিজেপি ও সংঘ পরিবার এবার তাদের মত করে ইতিহাস লিখবে। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আর এস এস-এর মুখপত্র 'অরগানাইজার'র সম্পাদক বলেছেন, 'আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লিখতে চাই।' (দি টেলিগ্রাফ, ২-৮-৯৮)। এগুলির কোনটাই প্রধানমন্ত্রীর অজানা নয়। তিনি শুধু বিজেপি'র নেতা নন, নিজের সম্পর্কে তিনি নিজেই ওয়াশিংটনে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে জোরগলায় ঘোষণা করেছেন, 'আমি একজন স্বয়ংসেবক (RSS) — এটাই আমার প্রথম ও শেষ পরিচয়।' সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইতিহাসের 'প্রকৃত তথ্য' হচ্ছে সেটাই, যা আর এস এস বলবে ও লেখাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "গেরুয়া হচ্ছে ত্যাগের রঙ, আমাদের রঙ, কাজেই যোশী গেরুয়াকরণ করবেন না তো কি সবুজ রঙ করবেন?' এই কথার দ্বারা বাজপেয়ীজীর পুরো মুখোশটাই খুলে পড়েছে। তিনি 'আমাদের রঙ' বলে সংকীর্ণ হিন্দুত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতেই ইতিহাস বিকৃতিকে সমর্থন করলেন। অর্থাৎ ইতিহাসে যাই ঘটুক তাতে গেরুয়া রঙ-এর প্রলেপ দেওয়া হবে। আর সবুজ রঙ-এর উল্লেখের সঙ্গে যোশী এবং বাজপেয়ীর তীব্র মুসলমান বিদ্বেষও প্রকাশ হয়ে পড়েছে, যদিও এটা নতুন নয়। কিন্তু ভারতের ইতিহাস রচনায় কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হবে, অথবা ইতিহাসে তথ্য বিকৃত করা হচ্ছে কি না, সেই বিতর্কে রং-এর ভালমন্দের আলোচনা তোলাই হয় কেন, এবং ইতিহাস রচনার সাথে ত্যাগের সম্পর্ক কি, তার জবাব প্রধানমন্ত্রীই দিতে পারেন।

একথা ঠিক, গেরুয়া রঙ-এর সাথে একটা ত্যাগের ধারণা মিশে রয়েছে হিন্দু মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের মধ্যে। সাধু সন্ন্যাসীরা এই রং-এর পোষাক পরিধান করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা প্রবাদবাক্য প্রচলিতই আছে যে, 'গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না।' বামপন্থী রাজনীতিতেও আছে 'মার্কসবাদের নাম নিলেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না।' ফলে গেরুয়া রং-এর প্রলেপ দিলেই তা ত্যাগের প্রতীক হয় না বা হতে পারে না। তাছাড়া সাধু-সন্ন্যাসীরা ধর্মচর্চায় ব্যবহার করতেন গেরুয়া বসন। বর্তমানে বাজপেয়ীজীরা রাজনৈতিক নেতা হয়ে সেই রং যখন রাজনীতিতে ব্যবহার করেন তখন প্রশ্ন তো জাগবেই। তাঁরা তো সন্ন্যাসী নন। তাঁরা গেরুয়া রং নিয়ে ভোটে ক্ষমতা দখল করছেন। হিন্দুধর্মেরই মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে যে, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা বা ধর্মবাণিজ্য হল নিকৃষ্টতম অপরাধ। (সূত্র ঃ ক্ষিতিমোহন সেন, হিন্দু-মুসলমান মিলিত সাধনা)। তাছাড়া 'ত্যাগের প্রতীক' গেরুয়া রংকে আমাদের রং বলে বাজপেয়ীজীরা ত্যাগের মূর্তিমান ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেও এই গেরুয়াধারীরাই এবং তাদের জোট শরিকরা মিলে তহলকা কাণ্ড ঘটিয়েছেন, কফিন কেলেঙ্কারী করেছেন, বিজেপি নেতা ভেঙ্কাইয়া জমি নিয়ে কেলেঙ্কারী করেছেন, কারগিল যুদ্ধের সময় যখন জওয়ানরা প্রাণ দিচ্ছে তখন বাজপেয়ীর পালিত জামাই নওয়াজ শরিফের ছেলের সঙ্গে চিনির ব্যবসায় লেনদেন করেছেন। এগুলি কি ত্যাগের প্রতীক? যদি কিছুমাত্র তারা ত্যাগ করে থাকেন তাহল নীতিবোধ — অন্যকিছু নয়।

এরকম গেরুয়াধারীদের সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা (বর্তমানের আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দুমাত্রই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। ....এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন, তাদের কথা কেউ শুনবেন না।' (আনন্দবাজার, ১৫-৫-'৪০) এতসব ঘটনার পর বাজপেয়ীজীর কথা শোনা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব কি? এই গেরুয়া রং নিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করেই বাজপেয়ীজীরা কীভাবে গদির হীন রাজনীতি করছেন, তার মর্মান্তিক উদাহরণ গুজরাট। সেই গুজরাট নিয়ে গৌরবের কমতি নেই বাজপেয়ীজীর। বাজপেয়ীজী গর্বের সাথে বলেছেন, আগামী দিনে বিজেপি গুজরাটের পথেই চলবে। আর গুজরাট কলঙ্কের নায়ক মোদী বলেছেন, বাজপেয়ীজী হচ্ছেন সূর্য, এবং তিনি নিজে সেই সূর্যের আলোকে আলোকিত চন্দ্র।

মনে পড়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ১৯৯৫ সালে বাজপেয়ীজী বলেছিলেন, 'হিন্দু সমাজে বর্তমানে একটা জাগরণ এসেছে। আগে হিন্দুরা আগ্রাসনের সামনে যেভাবে মাথা নত করত, এখন আর তা করে না। হিন্দু সমাজের এই পরিবর্তন অভিনন্দন যোগ্য।' (অর্গানাইজার, ৭-৫-৯৫) এই অভিনন্দন জানিয়েছেন যিনি — সেই প্রধানমন্ত্রী গেরুয়া রং নিয়ে তাঁর সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর ইতিহাস বিকৃতির সমর্থনে সাফাই গাইবেন এতে আর আশ্চর্য কি! এই হচ্ছে তথাকথিত নরমপন্থী, উদারমনস্ক, মূল্যবোধসম্পন্ন বাজপেয়ীজীর প্রকৃত চেহারা।

নকল ও আসল বন্‌ধের তফাৎ জনগণ বোঝেন

একের পাতার পর

বিদ্যুৎ পর্যদেও প্রসারিত হবে। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই আইনের ৩৯ ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারে। তা না করে সরকার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে হাইকোর্টে মামলা করার কথা শোনাচ্ছে। এই চালাকির আশ্রয় তারা নিচ্ছে কেন? একথা পরিষ্কার, যে হারে মাশুল বাড়ানো হয়েছে, তা গৃহস্থ গ্রাহকদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব।

ধনীদের জন্য রাজ্যের নানা স্থানে বিপুল ব্যয়বহুল চিকিৎসার নার্সিং হোম খোলা হচ্ছে, সরকার উৎসাহও দিচ্ছে প্রবল, কিন্তু গরিষ্ঠ জনগণের জন্য কী ব্যবস্থা? শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে শিশু মারা যাচ্ছে, গ্রামীণ হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে রোগী মরছে। এসব প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। এ অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর নামে সকল ক্ষেত্রে সরকার চার্জ বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি পথ্যের উপরও চার্জ বসিয়েছে। কম খরচে গরিবের যৎসামান্য চিকিৎসা পাওয়ার যতটুকু সুযোগ ছিল, এর দ্বারা সেটাও কেড়ে নিচ্ছে সরকার।

একইভাবে এ সরকার শিক্ষায় বিপুল হারে ফি বাড়িয়েছে, জলকর বসানোর ঘোষণা করেছে। কোর্ট ফি, জমির খাজনা, জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশন ফি, জমির মিউটেশন, বাস-ট্রাম ভাড়া ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ফি ও চার্জ বসিয়েছে, না হয় বাড়িয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে শর্তাধীন ঋণ নেওয়ার বিরুদ্ধে সি পি এম নেতারা বক্তৃতা করেন, অথচ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের শর্ত মেনেই ফ্রন্ট সরকার পেট্রল-ডিজেলের উপর লিটার প্রতি ১ টাকা সেস বসিয়েছে। জলকর বসাচ্ছে তাদের শর্ত মেনে, ঝুপড়ি ও খালধারের জনবসতিতে বুলডোজার চালিয়ে আগুন ধরিয়ে নিঃস্ব গরিব মানুষকে উৎখাত করেছে ঐ ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়ার জন্যই।

একথা পরিষ্কার, রাজ্যের গরিব-মধ্যবিত্ত জনগণের বিরুদ্ধে সরকার আর্থিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এখন জনগণ কী করবে? মুখ বুজে পড়ে পড়ে মার খাবে? অসহায়ভাবে প্রাণ দেবে? নাকি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে? মানুষের বাঁচবার পথ কোন্‌টা?

যারা বলেন আন্দোলন মানে অশান্তি, গণআন্দোলনের পথে নেমে মানুষ মিছিল, আইন অমান্য, অবরোধ, ধর্মঘট, বন্‌ধ ইত্যাদি করলে তার দ্বারা গোলযোগই কেবল সৃষ্টি করা হয়, তাদের আজ স্পষ্টভাবে জানাতে হবে সরকারি এই আক্রমণের মুখে মানুষ বাঁচবে কি উপায়ে? যারা বন্‌ধে গরিবদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বলে অহরহ প্রচার করছেন, সেই গরিব মানুষ ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের চাপে প্রতিদিন যে মৃত্যুকে বরণ করছে তার জবাব কে দেবে? যে সরকারের মন্ত্রীরা নন্দনে ফিল্ম উৎসবে সময় দিতে পারেন, হোপ '৮৬তে সারারাত কাটাতে পারেন, দিনের পর দিন মালিকদের সভায় উপস্থিত থেকে ভাষণ দেওয়া সহ খানাপিনা করতে পারেন, অথচ গরিব মানুষের দাবি সম্বলিত কোন ডেপুটেশনের সাথে দেখা করার সামান্য সময়টুকুও দিতে পারেন না, সেখানে গরিব মানুষ যাবে কোথায়?

এই অবস্থায় গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা আক্রান্ত মানুষের সামনে খোলা আছে কি?

এই আন্দোলনের 'ফর্ম' বা রূপ কী হবে, তা নিয়েও ইদানীং নানা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বিশেষত আন্দোলনের একটা বিশেষ রূপ হিসাবে বন্‌ধ — যা পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে তো বটেই, বিশ্বের সকল দেশে আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার রূপে স্বীকৃত, তার বিরুদ্ধেও পরিকল্পিত প্রচার চালানো হচ্ছে। গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে সরাসরি সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার আগে শাসকশক্তি চেষ্টা চালায়, যাতে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে, আন্দোলনের ফর্ম সম্পর্কে, আন্দোলনের নেতৃত্বকারী শক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করা যায়, তাদের সংগ্রামী মানসিকতাকে ভোঁতা করে দেওয়া যায়। যেমন এতদিন বলা হচ্ছিল, আন্দোলন করে কিছু হবে না। এখন আক্রান্ত জনগণের সংগ্রামী মেজাজ লক্ষ্য করে প্রচার করা হচ্ছে, বন্‌ধ করে জনজীবন অচল করে দেওয়া ঠিক নয়, অথবা বন্‌ধ হচ্ছে আন্দোলনের শেষ অস্ত্র। এই কথা কি সত্য? দেশে দেশে বহু আন্দোলন হয়েছে, বা আজও হচ্ছে, অনেকক্ষেত্রেই যার শুরুই ঘটছে বন্‌ধের মধ্য দিয়ে। যেকোনও আন্দোলনের মূল কথা দাবি আদায় করা। যতদিন সে দাবি আদায় না হচ্ছে এবং জনগণ লড়াই চাইছে, ততদিন মিছিল-অবরোধ-অবস্থান-ধর্মঘট-বন্‌ধ-আইন অমান্য ইত্যাদি নানারূপে আন্দোলন চলতেই থাকবে। কখন আন্দোলনের কোন্‌ কর্মসূচি নেওয়া হবে, তা নির্ভর করে আন্দোলনের দাবি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা, মানসিকতা, অংশগ্রহণ, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সংগঠন ইত্যাদি বহু বিষয়ের উপর। একই দাবিতে দফায় দফায় একাধিকবার বন্‌ধ হতে পারে। আন্দোলনের সূচনায় হতে পারে, আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বনধ্‌ ডাকা হতে পারে, আবার আন্দোলনের তুমুল জোয়ার তৈরি হলে দিনের পর দিন টানা বনধ্‌ হতে পারে, তা হয়ও। এও ঘটতে পারে যে, লাগাতার বনধ্‌ পালনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিল, সরকার দাবি মানতে বাধ্য হল। কাজেই ধর্মঘট ও বনধ্‌ আন্দোলনের একেবারে শেষ অস্ত্র — একথা কেবলমাত্র আন্দোলনবিরোধীরাই বলতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, বন্‌ধ বা ধর্মঘট গণআন্দোলনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী অস্ত্র।

সরকার ও শাসকশক্তি 'গরিবের উন্নয়ন করছি' এই প্রচার করে জনগণকে ভাঁওতা দিচ্ছে, গদিতে থাকার জন্যই মিথ্যাচার করছে। ভোট রাজনীতিতে যারা বিরোধী পক্ষে থাকে, তারাও গদিতে যাওয়ার জন্য ভোট টানতে আন্দোলন আন্দোলন খেলা করে জনগণকে ভাঁওতা দেয়। এরাই আন্দোলনের কোনও কর্মসূচি বা প্রস্তুতি ছাড়াই যখন তখন ধর্মঘট - বন্‌ধ ডাকে। জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যে বন্‌ধের মত আন্দোলনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারকে এইভাবে সংকীর্ণ দলীয় সুবিধাবাদী স্বার্থে বারবার ব্যবহার তার ধার ভোঁতা করে দেওয়া হচ্ছে। এদের এই হীন রাজনীতিই এই রাজ্যে "ছুটির বনধ্‌" কথাটি চালু করে দিয়েছে। যেমন সি পি এমের দলছুট একটি গোষ্ঠী হঠাৎ ১০ জানুয়ারি একটা বাংলা বনধ্‌ ডেকে দিয়েছিল। ঘরে বসে শুধু কাগুজে বিবৃতি দিয়েই এরা দায়িত্ব সেরেছে। বনধ্‌ের আগেও তাদের কোন কর্মসূচি ছিলনা, ভবিষ্যতেও কোনও কার্যক্রম এদের নেই, শুধুমাত্র পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এরা জেগে উঠেছে। 'গণতন্ত্র' 'বামপন্থা' 'ধর্মনিরপেক্ষতা' 'সমাজবাদ' ইত্যাদি বুলি আওড়ে এরা আশ্রয় নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মত দক্ষিণপন্থী শিবিরে পঞ্চায়েতে ২/৪টি সীট পাওয়ার লোভে। এই দলগুলির কোনটাই যে আন্দোলনের শক্তি নয়, একথা বারবার প্রমাণ হয়েছে। গোটা রাজ্যের জনগণ জানেন, বিদ্যুৎ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন একমাত্র এস ইউ সি আই-ই গড়ে তুলছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা একথাও জানেন যে, ভোটের দিকে তাকিয়ে নয়, প্রকৃত জনস্বার্থ নিয়ে একমাত্র এস ইউ সি আই লড়াই করে। একমাত্র এই কারণেই এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের কর্মসূচির প্রতি জনগণের সমর্থন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ভিত্তিতেই দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে তার ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে গত ১৬ নভেম্বর ঘোষণা করা হয়েছিল যে জানুয়ারি মাসের শেষে বনধ্‌ ডাকা হবে এবং সেই অনুযায়ী ১৭ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয় ২৭ জানুয়ারি বনধ্‌ের কর্মসূচি। এই সবকিছু জেনেও ঐ গোষ্ঠীটির হঠাৎ ১০ জানুয়ারি বনধ্‌ ডাকার উদ্দেশ্য কি ছিল? এর উদ্দেশ্য, মূল আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বহু আগে ডাকা ২৭ জানুয়ারির বন্‌ধ সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং বন্‌ধ বিরোধীদের 'ছুটির বন্‌ধ' নামক প্রচারকেই মদত দিয়ে আন্দোলনেরই ক্ষতি করা নয় কি? তাদের ডাকা এই বন্‌ধ শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেও বন্‌ধের মত গণআন্দোলনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে সাহায্য করল না কি?

কোনটা 'ছুটির বন্‌ধ' আর কোনটা যথার্থ আন্দোলনের বন্‌ধ, 'স্বতস্ফূর্ত বন্‌ধ' — এই তফাৎ জনগণ নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারেন। এই কারণেই ১০ জানুয়ারি বন্‌ধকে তারা সমর্থন করেননি। জনসাধারণের সংগ্রামী মেজাজ যত বাড়বে, সংগঠিত আন্দোলন যত দানা বাঁধবে, ততই মনে রাখতে হবে, তাকে ভাঙার জন্য, দিকভ্রান্ত করার জন্য আরও নানা কৌশলী ষড়যন্ত্র হবে, যেগুলি চিনতে ও ধরতে না পারলে জনগণ ঠকবেন।

১৯৯০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, ৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালের ১০ জানুয়ারি

আটের পাতায় দেখুন

বাংলা বন্‌ধের সমর্থনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

৮ জানুয়ারি এক সা)বাদিক সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা সমস্ত স্তরের স)গঠিত ও অস)গঠিত শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের স)গঠনগুলিকে ২৭ জানুয়ারির বন্‌ধ-এ সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন ঃ

১। বন্‌ধের ইস্যুগুলির সঙ্গে সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের জীবন ও জীবিকার ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ নিবিড়ভাবে যুক্ত।

২। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে অনুসৃত বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ নীতির পরিপূরক রাজ্য সরকারি নীতির কারণে কর্মী ও কর্মসঙ্কোচন এবং শ্রম অধিকার হরণ এ রাজ্যেও এক শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। উত্তরবঙ্গের ১৮টি চা-বাগানে অন্যায় ও বেআইনী লকআউটের কারণে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন। রাজ্যে ৩০৫টি বড় ও মাঝারি সংস্থা লকআউটের কবলে। বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোট ছোট কারখানার সংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি। রাজ্য সরকারও ৬৪টি সংস্থা বন্ধ করার অথবা বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে সরকারি কর্মীদের ছাঁটাইয়ের উদ্দেশ্যে কর্মী চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কলকাতা করপোরেশনে ১৫,০০০ কর্মী উদ্বৃত্ত ঘোষণা হয়েছে। অন্যদিকে নতুন কোন কর্মসংস্থান হচ্ছেনা। লক্ষাধিক শূন্যপদ খালি।

৩। মালিকরা পি এফ এবং ই এস আই-এর টাকা নিরাপদে আত্মসাৎ করছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং আত্মসাৎবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের উপর গুলি চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর শ্রমিক আন্দো-লন বিরোধী বক্তব্যে মালিকরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জবরদস্তি কালাচুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য দেওয়া হচ্ছে না। সমস্ত ধরনের অর্জিত অধিকার আজ বিপন্ন।

৪। এই সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যথার্থ গণআন্দোলনের সঙ্গে তার নিবিড় ঐক্য গড়ে তোলা শ্রমিকশ্রেণীর আজ জরুরি দায়িত্ব।

উপরোক্ত কারণে ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধকে নিজেদের আন্দোলনে পরিণত করার জন্য তিনি শ্রমজীবী জনগণের কাছে আহবান জানিয়েছেন।

কমরেড ধীরেন ভান্ডারীর স্মরণসভায় হাজার হাজার মেহনতি মানুষের শ্রদ্ধা

সুন্দরবন অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা, এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১ জানুয়ারি জয়নগরে দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৮ জানুয়ারি নলগড়ার স্কুল মাঠে আহবান করা হয়েছিল স্মরণসভা। দুপুর হতেই নলগোড়া ও চুপড়িঝাড়া অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ স্কুল মাঠে সমবেত হতে থাকেন। বিকাল ৩টায় যখন স্মরণসভা শুরু হল তখন সেখানে প্রায় ১০ হাজার মানুষের জমায়েত। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হতেই সারা মাঠের মানুষ উঠে দাঁড়ান।

নলগড়া সহ এদিককার বিভিন্ন অঞ্চলের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে কমরেড কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর অবিস্মরণীয় ভূমিকা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা জানান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কুলতলি কেন্দ্রের বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত।

এক বার্তায় প্রয়াত কমরেডে সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভায় সেই বার্তাটি পাঠ করে শোনান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য, দলের পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, ১৯৫১ সালে যখন কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী এস ইউ সি আই-এর সাথে নিজেকে যুক্ত করেন, তখন এই দলের কোনও পরিচিতিই ছিলনা। প্রভাবও ছিল নগণ্য। তখন এই জেলায় বামপন্থী দল হিসাবে সি পি আই ছিল অনেক বেশি পরিচিত। অন্যান্য বামপন্থী দলও ছিল। তবুও কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী যে এস ইউ সি আই দলকেই শোষিত শ্রেণীর সত্যিকারের বিপ্লবী দল হিসাবে চিনে নিতে পেরেছিলেন, এটা তাঁর প্রখর শ্রেণীবোধেরই পরিচায়ক। এই দলের যে বৈশিষ্ট্যটা তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহায্য করেছিল, তাহলে এই দলের নেতারা যা বলেন, জীবনেও তার চর্চা করেন।

১৯৫৯ সালে এই অঞ্চলে একটি শিক্ষাশিবির পরিচালনার কাজে এসে প্রয়াত কমরেডের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কমরেড মুখার্জী বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে তার জানার আগ্রহ ছিল প্রবল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতেন। বিপ্লব ও দলের সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সৈনিক। পঞ্চায়েতের সদস্য কিংবা প্রধান হওয়ার প্রতি কোনও কমরেডের আকাঙ্ক্ষা দেখলে তিনি ব্যথা পেতেন। তার কাছে দলের দায়িত্ব পালন করার চেয়ে অন্য কোনকিছুই বড় ছিলনা।

স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান।

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী আমৃত্যু বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন

[প্রয়াত কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ৮ জানুয়ারি নলগড়ার স্মরণসভায় নিম্নলিখিত বার্তাটি প্রেরণ করেন।]

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী আমৃত্যু বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। পাঁচের দশকের একেবারে গোড়ায় আমি যখন স্কুলের ছাত্র, তখন তাঁর সাথে চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ হওয়ার আগেই কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে ধীরেনবাবুর প্রথম পরিচয় পাই। তিনি খুব উচ্ছ্বসিতভাবে ধীরেনবাবুর চরিত্রের প্রশংসা করেছিলেন। প্রয়াত কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড প্রীতীশ চন্দ এবং দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী — এঁরা সকলেই কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন।

প্রচলিত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর শৈশব ও কৈশোর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। ভুক্তভোগী হয়ে গ্রামীণ জমিদার ও জোতদারদের নিষ্ঠুর শোষণ ও নিপীড়নের জ্বালা তিনি বুকে বহন করতেন। পাঁচের দশকের প্রথম দিকে ঐ এলাকায় কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাকে হাতিয়ার করে কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এবং কমরেড ইয়াকুব পৈলানের কর্মপ্রচেষ্টায় গরিব চাষি, ভাগচাষি, খেতমজুরদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। দিনমজুর কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী ঐ সময়ে এদেশের সর্বহারাশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল ও কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং গরিব মানুষকে সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এভাবেই সুন্দরবন সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় গরিব মানুষের সংগ্রামী নেতা হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন।

তিনি যখন দলে আসেন তখন রাজ্যের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, শহরাঞ্চলে একমাত্র বামপন্থী দল হিসাবে অবিভক্ত সি পি আই-এর (তার মধ্যে আজকের সি পি এম ছিল) বেশ কিছু প্রভাব ছিল। আজকের মত আমাদের দলের

১ জানুয়ারি কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান

প্রসার ও জনপ্রিয়তা ছিল না, দল ও কমরেড ঘোষের নাম খুবই অপরিচিত ছিল। কাগজপত্রে কোন নাম গন্ধ নেই, লোকজন নেই, '৫২ সালের আগে দলের এম এল এ, পঞ্চায়েত (তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ড) এসব থাকার কোন প্রশ্ন নেই। তা সত্ত্বেও অত্যাচারিত খেতমজুর ঘরের এই নিরক্ষর সন্তান কিসের আকর্ষণে এস ইউ সি আই দলে যুক্ত হন? তিনি যুক্ত হন কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দুর্নিবার আকর্ষণে। ঐ বয়সেই তিনি শোষিত জনগণের মুক্তি সংগ্রামে প্রকৃত পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ ও যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে চিনতে ভুল করেননি। সেদিন চিনতে পারাটা কম কথা ছিল না। তিনি চিনতে পেরেছিলেন গ্রামীণ সর্বহারা খেতমজুরের সহজাত শ্রেণীচেতনা থেকে।

নিজে অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হয়ে সর্বক্ষণ এর ব্যথা-বেদনা জ্বালা যেমন বুঝতেন, শোষিত উৎপীড়িত মানুষের আর্তনাদ যেমন বারবার তাঁকে প্রতিবাদের আন্দোলনে টেনে নিয়ে যেত, অন্যদিকে প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এই অশিক্ষিত মানুষটির জ্ঞান-পিপাসাও ছিল খুবই প্রবল। কমরেড ঘোষ ঐ সময়ে সদ্য দলে আগত গরিব চাষি ও খেতমজুর কর্মীদের বিপ্লবী রাজনৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করার জন্য এই অঞ্চলে বেশ কিছু রাজনৈতিক শিক্ষা-শিবির করেছিলেন। ঐ রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর সত্যানুসন্ধানী মন যে রকম গভীরভাবে জানা ও বোঝার জন্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দর্শন, রাজনীতি, আন্দোলন, সংগঠন এসব বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে বারবার প্রশ্ন করত সেটা অনেককেই বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। এটা উপর থেকে ভাসাভাসা জানা নয় — একেবারেই অন্তরের ভেতর থেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সংগ্রাম ছিল। দলের বিপ্লবী রাজনীতি ভালভাবে জানার জন্য পরে তিনি কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলেন এবং দলের প্রকাশিত প্রত্যেকটি পুস্তক ও মুখপত্র তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তেন। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মূল দর্শনগত বিষয়, দলের রাজনৈতিক বক্তব্য, আন্দোলন ও সংগঠনগত সমস্যা, কর্মীদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা, দলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও বিপ্লবীদের আচার-আচরণগত দিক প্রভৃতি প্রশ্নে এত সহজ সরল গ্রাম্য কথায় প্রাণবন্ত করে বলতেন, অন্যরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অন্তর দিয়ে দলীয় শিক্ষা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই এভাবে তিনি বলতে পারতেন।

পারিবারিক জীবনে চরম দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও তিনি অল্প দিনের মধ্যেই পিছনের দিকে না তাকিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে দলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরিবারকেও দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

সেই সময় একদিকে জমিদার-জোতদারদের প্রবল মধ্যযুগীয় দাপট, তাদের লাঠিয়াল বাহিনীর অত্যাচার, পুলিশের হামলা — যার ফলে সাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়-ভীতি, তার মধ্যে তখনকার দিনের যানবাহনহীন, নদীবহুল, জঙ্গলে পরিপূর্ণ গ্রাম্যপথে কখনো স্বল্প সাথী নিয়ে, কখনো একাই দূরে দূরে যাওয়া, পিছনে লাঠিয়াল বাহিনী ও পুলিশের তাড়া-খাওয়া, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে কাজ করা — এই ছিল তখনকার দিনে কমরেড ধীরেনবাবুদের পার্টি সংগঠন ও আন্দোলন গড়ার দৈনন্দিন ইতিহাস।

কঠোর দারিদ্র্য, প্রবল বিরুদ্ধতা, শত্রুপক্ষের অত্যাচার, সহকর্মীর স্বল্পতা, সবকিছু অগ্রাহ্য করেই তিনি কমরেড ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাকে হাতিয়ার করে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন।

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী উন্নত বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সাধনায় নিরন্তর রত ছিলেন এবং অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের জন্য কমরেড ঘোষের শিক্ষাকে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য সংগ্রাম করতেন, কখনো সাময়িক আপসে আচ্ছন্ন হলে নিজেই বিবেক দংশনে ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতেন, আবার নতুন উদ্যমে ত্রুটি সংশোধনে ব্রতী হতেন। মুখে যা বলতেন কাজেও তাই করতেন। ছোট বড় যে কোন স্তরের দলের কর্মী এবং সাধারণ মানুষ থেকে তাঁর শেখার মন ছিল, অপরের সমালোচনারও খুব মূল্য দিতেন। কোন কর্মীর কাজকর্মে গাফিলতি দেখলে, চারিত্রিক কোন ত্রুটি দেখলে খুবই ব্যথা পেতেন, স্নেহময় পিতার মত গভীর মমতায় সাধ্যমত চেষ্টা করতেন কিভাবে সেই কর্মীকে ত্রুটিমুক্ত করা যায়। এই সৎ, সরল, গরিব দরদী, পরোপকারী, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, নিরহংকারী মানুষটিকে সর্বস্তরের জনগণ, এমনকি বিরোধী পক্ষের লোকেরাও ষোল আনা খাঁটি বলে শ্রদ্ধা ও

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২৩ সংখ্যা ৮

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে আন্দোলন

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শুধু পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ গ্রাহকরাই পথে নেমেছেন তা নয়, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অন্যান্য রাজ্যেও গ্রাহকদের আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশেও এই আন্দোলনে এস ইউ সি আই দল ও দলের গণসংগঠনগুলি সামিল হয়েছে।

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক ৩০% বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কয়েকটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে জবলপুরে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংঘর্ষ সমিতির নেতৃত্বে ১ ডিসেম্বর মালবীয় চকে এক বিশাল মানব-শৃঙ্খল তৈরি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ৩ ডিসেম্বর এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বেরোলে, মিছিল থেকে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ৪ ডিসেম্বর জবলপুর বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংঘর্ষ সমিতির বৈঠকে নাগরিক উপভোক্তা মার্গ দর্শক মঞ্চের অধ্যক্ষ ডাঃ পি জি নাজপাণ্ডে বলেন, বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে ৯০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন, রাজ্য সরকারের যেখানে ৪৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা, সেখানে মাত্র ৪৫০ কোটি টাকা তারা দিয়েছে। যদি সরকার ভরতুকির পুরো টাকাটা দিয়ে দিত, তাহলে ৩/৪ বছরের মধ্যে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হত না। বৈঠকে বহু শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন। করমচাঁদ শহরের কফি হাউস থেকে একটি মিছিল মালবীয় চকের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে প্রবীণ নেতা মহেন্দ্র বাজপেয়ী মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। জবলপুর বণিকসভার চেয়ারম্যান বলেন, বিদ্যুৎ পরিবহন ও বণ্টনে অপচয় যদি ১৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ঘাটতি পূরণ হয়ে যেতে পারে।

এস ইউ সি আই-এর ভবানী ঘোষ, রাজ্য সংযোজক ইউ পি বিশ্বাসের মতে, গৃহস্থ গ্রাহকদের ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত খরচ হলে ৫৭%, ৫১-১৫০ ইউনিট পর্যন্ত ৬৬.৬৯% এবং তার ওপর হলে ২৪% পর্যন্ত দামবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

হাসপাতালের চার্জ

পাঁচের পাতার পর

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ কমানো।

হাসপাতাল পরিষেবার যাবতীয় গলদ চাপা দেওয়া, সরকারি দায়িত্ব অস্বীকার করা এবং নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য তাঁরা কঠোর প্রশাসনিক দমননীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। "উন্নততর" বামফ্রন্টের হাতে গণতন্ত্র অটুট — এই স্লোগানের আড়ালে তাঁরা সরকারি হুকুমে হাসপাতাল সুপারদের বিবৃতি দেওয়া বন্ধ করেছেন, বিনা অনুমতিতে সাংবাদিকদের হাসপাতালে ঢুকে সংবাদ সংগ্রহ বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তমলুক হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যুর ঘটনা চাপা দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানোয় আমাদের দলের কর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পুরেছেন।

কিন্তু তার দ্বারা সত্যকে চাপা দেওয়া যায়নি। তমলুক হাসপাতালের বাথরুম থেকে রোগী নকুল মাইতির মৃতদেহ উদ্ধার, বর্ধমান মেডিকেল কলেজে একদিনে ১৪টি শিশুর মৃত্যু, এ ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে ধারাবাহিকভাবে। এমন যে ভাঙাচোরা চিকিৎসাব্যবস্থা সেখানেও চিকিৎসা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে না। সরকার বলছে কেবল বি পি এল কার্ডধারীরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবে। বি পি এল কার্ড দেওয়ায় যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা সি পি এমই এখন স্বীকার করছে। বি পি এল কার্ড পেতে হলে শাসকদলের অনুগ্রহ পেতে হবে। এই হল বাস্তব অবস্থা।

প্রশ্ন হল, সাধারণ মানুষ একে মেনে নেবেন কেন? পশ্চিমবঙ্গের ৯ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটিই গরিব, পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করাতে পারবেন না। তাঁদের প্রতি স্বঘোষিত গরিবের সরকারের কি কোন দায়িত্ব নেই? মালিকগোষ্ঠীকে করছাড় দিতে টাকার অভাব হচ্ছে না, দুর্নীতির চোরাপথে কোটি কোটি টাকা যাচ্ছে, নেতা-মন্ত্রীদের বিলাসব্যসনে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ছে, অথচ শিক্ষায়, চিকিৎসায় সরকারের টাকা নেই। অর্থাভাবের অজুহাতে যে জনগণের ঘাড়ে তাঁরা বোঝা চাপাচ্ছেন সেই জনগণের ঘরে কি টাকা উপচে পড়ছে? সরকারি হাসপাতালের দরজা বন্ধ হলে গরিব মানুষকে জমি বাড়ি ঘটি বাটি বেচে নিঃস্ব হতে হবে, না হয় বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে।

এর বিরুদ্ধেই ২৭ জানুয়ারি গরিবের বাঁচার দাবিতে বাংলা বনধ হচ্ছে দীর্ঘ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায়। ইতিমধ্যেই যতটা আন্দোলন হয়েছে তার চাপে হাসপাতালের বিপুল বর্ধিত চার্জ অনেকটা কমাতে সরকার বাধ্য হয়েছে। এই সাফল্যের পটভূমিতে ২৭ জানুয়ারি বন্ধ অভূতপূর্বভাবে সফল করে আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে হবে যাতে দাবি পুরোপুরি মেনে নিতে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারকে বাধ্য করা যায়।

বিদ্যুৎ কমিশনের কাজ কি কেবল মাশুল বাড়ানো ?

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নোটিশের তীব্র বিরোধিতা করে ১১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

"২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ সালের বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে শুনানির জন্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নোটিশ আমাদের নজরে এসেছে।

কমিশনের কাজ দাঁড়িয়েছে নানা অজুহাতে লাইসেন্সির পক্ষ অবলম্বন করে প্রতি বছর বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিশ্বায়নের অর্থনীতির প্রয়োজনেই কমিশনকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে।

আমরা অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে কমিশনের এই জনস্বার্থবিরোধী প্রচেষ্টা বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।"

২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

ছয়ের পাতার পর

পশ্চিমবাংলার বুকে এস ইউ সি আই-এর ডাকে যে সফল সর্বাত্মক বনধ্‌ হয়েছিল, জনগণ জানেন ও বলেনও যে, তা ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ — ওপর থেকে 'চাপানো' বা 'ছুটির বন্‌ধ' ছিল না। আগামী ২৭ জানুয়ারি যে বনধ্‌ হবে সেটাও তেমনই যথার্থ আন্দোলনরূপী বনধ্‌ — যা আসছে গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এবং যে আন্দোলন বন্‌ধের মধ্য দিয়ে শেষ হবেই না, বরং আরও জোরদার হয়ে ভবিষ্যতে বিল বয়কট, আইন অমান্য, প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধ এবং প্রয়োজনে লাগাতার বনধ্‌ পর্যন্ত যাবে। জনগণও বলছেন, ২৭ জানুয়ারি হবে 'আসল বনধ্‌'।

'নকল' ও 'আসল'-এর এই মৌলিক পার্থক্য বুঝে নিয়ে, সকল অপপ্রচার ও বাধা উপেক্ষা করে ২৭ জানুয়ারির বাংলা বনধ্‌ জনগণ সর্বাত্মক সফল করবেন — এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী লালসেলাম

সাতের পাতার পর

বিশ্বাস করতেন। বিরোধী পক্ষের লোকদেরও তিনি পাল্টা বিদ্বেষ ও শত্রুতা দিয়ে নয়, দলের শিক্ষানুযায়ী ভালবাসা ও যুক্তি দিয়ে জয় করতেন। তাঁর কর্মসাধনার লক্ষ্যের মধ্যে নেতৃত্বের পদ পাওয়া, পঞ্চায়েতের চেয়ারে আসীন হওয়া, নাম-যশ অর্জন করা — এসব কিছুই ছিল না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কিভাবে কমরেড ঘোষের একজন্য যোগ্য ছাত্র হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন। কিভাবে শোষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করতে পারেন, অগ্রগতিকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারেন। আর এই গুণেই তিনি সকলের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যে সব চরিত্রের সামান্য সান্নিধ্য, দুটো কথায় ঘুমন্ত বিবেক জেগে ওঠে, কমরেড ভাণ্ডারী সেই বিরল চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

তিনি শুধু গণআন্দোলনের নেতাই ছিলেন না, পার্টির একজন উঁচুদরের নেতৃস্থানীয় সংগঠকও ছিলেন। নিরন্তর নীরব নিভৃত সাধনায় তিনি দলে বহু কর্মীকে যুক্ত করেছেন, অনেককেই আরও উন্নত হতে সাহায্য করেছেন, তার মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবকও আছেন।

দলের নেতৃত্ব ও নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর গভীর আনুগত্য ছিল। মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে, কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় যে কোন স্তরের, শ্রদ্ধাভাজন নেতার সাথে যুক্তি করতেন, মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা করতেন এবং যাই সিদ্ধান্ত হত তাকে কার্যকরী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, ফলে জয়নগরে ও কলকাতায় প্রায়ই দলীয় সভায় আসতে পারতেন না, কিন্তু আলোচনার বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্যদের থেকে সংগ্রহ করতেন এবং এলাকায় কর্মসূচি কার্যকরী করতে সাধ্যমত সাহায্য করতেন। তাঁর উপস্থিতিই ছিল সকলের জন্য জীবন্ত প্রেরণার উৎস।

মাত্র কিছুদিন আগে এই রোগজর্জর, মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবী নেতা চরম আঘাত পেলেন, যখন তাঁর চোখের সামনেই রাতের অন্ধকারে সি পি এম-এর কান্তি গাঙ্গুলী প্রেরিত ঘাতকদের দ্বারা তাঁরই সন্তানতুল্য, তাঁরই স্নেহছায়ায় লালিত-পালিত কমরেড অশোক হালদার নৃশংসভাবে খুন হন, কমরেড অশোককে বাঁচাতে গিয়ে কমরেড মোসলেম খুন হন। কমরেড ভাণ্ডারীর পুত্র কমরেড শঙ্কর ভাণ্ডারীও গুরুতর আহত হন। এই বর্বর আক্রমণে তিনি নিজেও রেহাই পাননি। এই আঘাত সামলানো খুবই কঠিন। শোকে-কান্নায় অনেকেই যখন আচ্ছন্ন, তিনি সকলকেই বল যুগিয়েছেন, তাঁর কন্যা — অশোকের স্ত্রী শোকাচ্ছন্ন কমরেড আশা ভাণ্ডারীরও তিনি প্রেরণার উৎস।

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হচ্ছে, তাঁর এই বরণীয় জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের গড়ে তোলা। সর্বস্তরে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা যদি এই সংগ্রামে ব্রতী হন, তাহলেই একমাত্র তাঁর মৃত্যুজনিত এই বিরাট ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হবে, তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা সম্ভব হবে।

প্রয়াত কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারী
লাল সেলাম।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net